

রাষ্ট্রদর্শনের আলোকে বাংলা মূলকে

# সিভিল সোসাইটি

॥ রাহমান নাসির উদ্দিন ॥

“একজন নাগরিক শাসক হন কোন অপরাধকর্ম বা অসহনীয় হিংস্রতার মাধ্যমে নয়, হয়ে থাকেন সহ-নাগরিকদের আনকূল্যে যাকে নাগরিকদের দ্বারা সৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা বলা চলে। এ অবস্থা পেতে হলে সম্পূর্ণভাবে যোগ্যতা বা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করতে হবে না। বরং নির্ভর করতে হবে ভাগ্যের সাহায্যপুষ্ট চতুরতার ওপর। এ অবস্থায় একজন শাসক পৌঁছাতে পারেন জনগণের আনুকূল্যে কিংবা অভিজাত শ্রেণীর সাহায্যে”/[N. Machiavelli, The Prince: 1993:73]

॥ পয়লা ॥

মানুষের নিজস্ব একটা স্বভাব আছে। আর সে স্বভাবে আছে ভাবের প্রভাব। আবার এ ভাবেরও একটা নিজস্ব ‘প্রবণতা’ আছে। এ দ্বৈত সঙ্গম-সৃষ্ট ‘ভাবপ্রবণতা’ই মানুষকে পরিচালিত করে। ভাবপ্রবণ মানুষ যতোটা না চলে, ততোধিক চালিত হয়। আর মানুষ হ’ল এমন একটা প্রজাতি, যারা প্রকার, প্রকরণ এবং প্রকৃতিগতভাবেই ‘ভাবপ্রবণ’। ‘ভাবপ্রবণতা’কে দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদি তত্ত্বের আয়না দেখলে এর সহি সুরত দেখা যায়। ‘ভাবপ্রবণ’ বা ‘ভাববাদি’ মানে আবেগ সর্বস্ব, পুরাতনকে আঁকড়ে ধরার মানসিকতা, নিশ্চল ও প্রতিক্রিয়াশীলতা। ফলে এ ‘ভাবপ্রবণ’ স্বভাবের একটা প্রভাব পুণরায় তার স্বভাবের ওপর পড়ে। এটাকে বলা যায় ‘ভাবচক্র’ বা ‘স্বভাবচক্র’। তাই মানুষের মধ্যে বস্তুবাদি হওয়ার লক্ষণ খুব কমই দেখা যায়। এখানে ‘বস্তুবাদি’ মানে যুক্তশীলতা, ক্রমবিকাশমানতা, সচলতা এবং প্রগতিমুখীতা<sup>১</sup>। সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মাজেজা এই যে, এটা মানুষকে ‘বস্তুবাদি’ হওয়ার চাইতে, ‘ভাববাদি’ হওয়ার প্রণোদনা দিয়েছে অপেক্ষাকৃত বেশি। শ্রেণীর স্বার্থও এখানে ক্রিয়াশীল। সমাজে সৃষ্ট শ্রেণী নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য সমাজের অন্তর্গত চলককে নিজের মতো করে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ফলে, সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ থেকেছে অন্ধকারে আর সংখ্যালঘু মানুষ নিজেদের বস্তুগত প্রাচুর্যের বিকাশের মধ্য দিয়ে সভ্যতার বিকাশের কীর্তন রচনা করেছে। মানুষের সভ্যতা এবং এর বিকাশ মূলতঃ আর্থিক বিকাশ ও বস্তুগত প্রাচুর্যের মাহাত্যে পূর্ণ। পুঁজির ভান্ডার সমৃদ্ধি, ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তির উদ্ভব এবং এর ঐতিহাসিক বিকাশের মধ্যদিয়ে বিকাশিত হয়েছে সভ্যতা<sup>২</sup>। ফলে শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার তাগিদেই ভাবের ঘোরের মধ্যে রাখা হয় ‘সাধারণ মানুষ’কে ওরফে ‘সিভিল’কে। মানুষের মৌলিক চিন্তার এবং অন্তর্গত বিকাশের গতিশীল প্রবণতাকে ভাবের টোপ দিয়ে বোবা করে রাখা হয়েছে। কেননা, ভাবের আফিম মানুষকে ঘোরের মধ্যে রাখে কিংবা ভাবের আফিম দিয়েই মানুষকে ঘোরের মধ্যে রাখা হয়। তাকে ‘বস্তুবাদি’ হতে দেয় না। পাছে, ‘ভাব’ ছুটে গেলে, ‘স্বভাব’ পরিবর্তিত হয়ে ‘অভাব’ের ব্যকরণ বুঝে নিজের শ্রেণী চরিত্র উপলব্ধি করবে। শ্রেণী সচেতন হয়ে উঠবে। আর একবার শ্রেণী সচেতনতা চাপা হলেই বিপদ। কতো ভয়ংকর বিপদ যে হতে পারে, ইতিহাসে র’শ বিপ্লব এবং চীনের বিপ্লবের মতো উদাহরণ আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে ইংল্যান্ডের শ্রমিক বিদ্রোহ (চার্চিয় বিপ্লব হিসাবে যা অধিকতর পরিচিত), ফ্রান্সের লিওঁ শ্রমিক বিদ্রোহ এবং জার্মানীর সাইলেসি অতীতের বিদ্রোহ<sup>৩</sup> প্রভৃতি এ শ্রেণী চেতনা চাপা হওয়ার ফসল। অতএব, বাঁচাধন ‘ভাব’ নিয়ে থাকো! স্বভাবে নিঃশর্ত আনুগত্য নিয়ে নির্বিরোধ থাকো। যেভাবে চলছে সেভাবেই চলুক। ‘অভাবে’ থাকো তবুও ‘ভাবের’ স্বভাবে থাকো। ‘বস্তুবাদি’ হয়ে কাজ নেই। এসব নাস্তিকতা। ঈশ্বরের পেয়ারা বান্দা হয়ে থাকো। লক্ষী সোনা! কিন্তু ‘বস্তুবাদি’ হওয়ার মধ্যেই মানুষের অস্বস্তির প্রশ্ন জড়িত। মানুষের স্বাধীনতা, অধিকার, চেতনা ও প্রগতির প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট। মানুষের ‘মানুষ’ হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার বিষয় সম্পৃক্ত। মহাত্মা কার্ল মার্ক্স (১৮১৮-১৮৮৩) বড় পান্ডিত্য দিয়ে এ বিষয়টি ব্যান করেছেন। শুধু ব্যানই করেননি। মানুষের চিন্তার জগতকে তোলপাড় করেছেন। প্রচলিত সনাতন চিন্তকে ভেঙ্গে চুরমার করে নতুন করে নির্মাণ করেছেন<sup>৪</sup>। আমাদেরও কিছু সনাতন চিন্তা আছে যা আমরা স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে চর্চা করি। বোধবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিনা। ভাঙ্গবার চিন্তাও করিনা। ফলে নতুন করে গড়বার চিন্তাও করিনা। আমাদের যাপিত জীবনে এরকম অসংখ্য উপাত্ত, বিষয়াদি এবং প্রত্যয়াদি আছে যা আমরা ভুলভাবে ব্যাখ্যা এবং চর্চা করি। ‘ভাবে’র ভায়ে আমাদের স্বভাবে বিকল্প চিন্তার বড়ই অভাব। তাই, আমাদের ওপর শ্রেণী সৃষ্ট জ্ঞান তত্ত্বের প্রবল প্রভাব। আমরা তাই চোখ থেকেও অন্ধ। কবি যতই বলুক ‘ওরে অন্ধ বন্ধ করোনা পাখা’। আমরা পাখা বন্ধ করেই আছি আজন্ম। আমরা আমাদের চেতনার কপাট বন্ধ করেই আছি। আমাদের অস্বপ্নিষ্ট অন্ধ হয়ে আছে। বা অন্ধ করে রাখা হয়েছে, সভ্যতার শুর<sup>৫</sup> থেকে অদ্যাবধি। কিন্তু রাষ্ট্রের কাঠামোই এই সমষ্টিগত অন্ধত্ব একটি অন্ধকার ভবিষ্যতের জন্ম দেয়। একটি অমানিষার আবির্ভাব ঘটায়। তাই, রাষ্ট্রদর্শনের বিষয়াদি সম্পর্কে আমাদের একটু মাথা ঘামানো দরকার বৈকি।

রাষ্ট্রদর্শনের এরকম একটি বিষয় হ’ল ‘সিভিল সোসাইটি’। হালে এ শব্দটি এবং বিষয়টি বেশ বাজার পেয়েছে। আর বাজার অর্থনীতির তত্ত্বানুযায়ী ‘সিভিল সোসাইটি’র বেনারে কিছু বিষয় এবং কিছু মানুষ ‘পপুলার’ পাশাপাশি বেশ ‘প্রফিটেবল’ও হয়েছে। আজকে আমরা রাষ্ট্রদর্শনের ল্যাবরেটরিতে নিয়ে এ ‘সিভিল সোসাইটি’তে একটু টেস্ট করবো। দেখবো, এটা তার গুণগত মান রক্ষা করেছে কিনা। নাকি আর দশটা বাজারী পণ্যের মতোই ভেজালে

পরিপূর্ণ। দেখবো, এটা তার ঐতিহাসিক এবং জনমগত দায়িত্ব পালন করছে কিনা। দেখবো, এ ‘সিভিল সোসাইটি’ কি ‘সিভিলদের’ খায় ‘সিভিলদের’ গুণ গায় নাকি সাম্রাজ্যবাদের খেয়ে সুশীল সমাজের মোষ তাড়ায়।

একটা দুর্ধর্ষ বাক্য গুঁহ দিয়ে বয়ান করা যাক। “শাসক মানে হেঁছ শোষক। কেননা শাসক শ্রেণী সর্বদা শাসনের নামে শোষণ করে। আর, শাসক সমাজ হেঁছ শ্রেণীগতভাবে সমাজেরই ‘এলিট সোসাইটি’। সুতরাং, ‘এলিট সোসাইটি’ মানে শোষক শ্রেণী। মুদ্রার অপর পিঠে, এলেম এবং আমলগত মেলা ফারাকার্থে ‘সিভিল সোসাইটি’ হেঁছ এক প্রকার ‘এলিট সোসাইটি’। সুতরাং ‘সিভিল সোসাইটি’ হেঁছ গুঢ়ার্থে সমাজের শোষক শ্রেণী। কেননা, এক কেজি লোহা আর এক কেজি তুলার মধ্যে ওজনগত কোন ফারাক নেই। তাই, ...”। এ কথা শুনে নিশ্চয় অনেকের ‘রেগে আগুণ’ এবং ‘তেলে বেগুণে’ অবস্থা। বিশেষ করে যারা শ্রেণীর অবস্থান থেকে বিষয়টি বিবেচনা করবেন। অর্থাৎ যারা ‘সিভিলদের’ কাতারে না গিয়ে ‘এলিট সোসাইটি’র দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে বিবেচনা করবেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হেঁছ আমাদের স্বঘোষিত অর্বাচীন শীলরা (!) কপাল কুঁচকে চোখ বড় করে আমার দিকে তাকালেও আমার পক্ষ নেয়ার জন্য ইতোমধ্যে প্রস্তুত হয়ে আছেন মহাত্মা মেকিয়াভেলি(১৪৬৯-১৫২৭), থমাস হব্‌স (১৫৮৮-১৬৩৭), জন লক(১৬৩২-১৭০৪), ডেভিড হিউম(১৭১১-১৭৭৬) এবং র’শো(১৭১২-১৭৭৮) প্রমুখের মতো দার্শনিকরা। এ সম্প্রদায় আরো সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়ে বোধগম্যতার ধোঁয়া সাফ করে বিষয়টিকে আরো খেলাসা করেছেন মহাত্মা হেগেল(১৭৭০-১৮৩১), কার্ল মার্ক্স(১৮১৮-১৮৮৩), এঙ্গেল্‌স (১৮২০-১৮৯৫) এবং এলেনিও গ্রামসি(১৮৯১-১৯৩৭) প্রমুখ অগ্রজরা। অতএব, কেবল সাহস নয়, রীতিমত দুঃসাহস করার সুযোগ আমার রয়েছে। এ নিবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য কাউকে আক্রমণ করা নয়। আমাদের অবস্থানকে হক ভাবে নির্ণয় করার একবার চেষ্টা করা। রাষ্ট্রের ‘স্বভাব চরিত্র’ ঠিক আছে কিনা দেখার পাশাপাশি সময় ও সমাজের অনিবার্য দাবি হিসাবে সত্যিকার যে ‘সিভিল সোসাইটি’ প্রয়োজন, তার পরিবর্তে আমাদের যা আছে, তার নিজের চরিত্র ‘সং’ কিনা তা দেখার জন্য নিজেদেরকে রাষ্ট্রদর্শনের মাহফিলে একবার হাজির করা। অবশেষে এ রাষ্ট্রদর্শনের আয়না আমাদের নিজেদের ‘চহারা মোবারকটা’কে একবার পরখ করে নেয়ার চেষ্টা করা। এবার ভূমিকার সদর থেকে আলোচনার অন্দরে প্রবেশ করা যাক।

## ॥ সোসরা ॥

রোমান ভাষায় ‘রাষ্ট্র’ মানে ‘সিভিটাস’। এই ‘সিভিটাসে’র অধিবাসীরাই ‘সিভিল’। গ্রীস ও রোমে রাষ্ট্র ছিলো নগর কেন্দ্রীক। ফলে, নগরের বাসিন্দারা ই ছিলো নাগরিক। যার সরলার্থ দাঁড়ায়। ‘সিভিটাস’ মানে রাষ্ট্র। ‘সিভিল’ মানে রাষ্ট্রের নাগরিক। আর ‘সোসাইটি’ মানে সমাজ। সুতরাং ‘সিভিল সোসাইটি’ মানে হেঁছ ‘নাগরিক সমাজ’ বা ‘নগর সমাজ’। ব্যবহারিক হেঁছ ‘সিভিল’ হলেও এটা প্রকৃত ‘সিভিল’ ওরফে ‘সাধারণের সমাজ’ নয়। ‘সিভিল সোসাইটি’র অর্থ কখনই অ-নাগরিক ওরফে ‘গ্রাম্য সমাজ’ হয়নি। কোনকালেই ‘সিভিল সোসাইটি’র মর্মার্থের ভেতরে নগরের বাইরে সমাজ বা ‘গ্রাম্য সমাজ’কে নেয়া হয়নি। আর ‘সিভিল সোসাইটি’র অর্থের চৌহদ্দিতে কোনকালেই ‘গ্রাম্য সমাজে’র ঠায় হয়নি। না অর্থ না ভাবে। না স্বভাবে না প্রভাবে। না কর্মে না ধর্মে। কিন্তু মর্মে থাকার কথা দেশের সাধারণ সমাজের খেটে খাওয়া ছা-পোষা(!) মানুষের। থাক। ছা-পোষার ঝামেলা পরে মেটানো যাবে! আগে সিভিলদের রাজ্যপাঠ হউক। এ ‘সিভিল সোসাইটি’কে বুর্জোয়া দার্শনিকের বরপুত্ররা সোহাগ করে ‘পলিটিক্যাল সোসাইটি’ নামে অভিধা দিয়েছেন। এ ‘সিভিল সোসাইটি’ কোন পুণ্যে আবার ‘পলিটিক্যাল সোসাইটি’ হলো তারও একটি শানে ন্যুল আছে। গ্রিক ভাষায় ‘পলিস’ মানে রাষ্ট্র। আর ‘পলিসে’র ভাবে মানুষের স্বভাবে আছে ‘পলিটিক্স’। তাই, এ ‘পলিসে’র সমাজই এক কাঠি সরস করে হয়েছে ‘পলিটিক্যাল সোসাইটি’। আজকের প্রবন্ধে ‘সিভিল সোসাইটি’ নামক যে মহাঘটি(!) নিয়ে আলোচনা হেঁছ, সতের দশকের রাষ্ট্রদার্শনিক জনলক হক করে একে বলেছেন ‘পলিটিক্যাল সোসাইটি’। এটাকে বাংলা করা যায় ‘রাষ্ট্রসমাজ’ নামে। সে ‘রাষ্ট্র সমাজ’ এতোদিনে হয়ে উঠেছে ‘ধনিক সমাজ’। ক্ষেত্র বিশেষে ‘বণিক সমাজ’। ফরাসি ভাষায় এর অর্থ দাঁড়ায় ‘বুর্জোয়া সমাজ’। আর জার্মান দার্শনিক মহাত্মা হেগেল একে বলেছেন ‘বুর্গার সমাজ’। ‘সাহেবরা’ ওরফে ইংরেজরা বলেন ‘সিভিল সোসাইটি’। আমরা পরের ধনে পোদ্দারী করে এর দেশীকরণ করেছি ‘সুশীল সমাজ’।

বর্তমানে ‘সিভিল সোসাইটি’ শব্দটি বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমান পরিবর্তিত ইউনিপোলার বিশ্বে এ ‘সিভিল সোসাইটি’ নতুন রাপে জারি হয়েছে। পৃথিবীর দেশে দেশে একটি প্রকৃত ‘সিভিল সোসাইটি’র প্রয়োজনীয়তা আজ তীব্রভাবে অনুভূত হেঁছ। বিশেষ করে, বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য ‘শ্রেণীবৈষম্য’ ও ‘শ্রেণীশোষণ’, রাষ্ট্র সেই শ্রেণীবৈষম্য ও শ্রেণীশোষণকে লালন করে, পালন করে এবং ধারণ করে। কিন্তু জনমগত এবং ঐতিহ্যগতভাবে সাধারণ ও অতি সরলীকরণ দৃষ্টিতে মনে হয় রাষ্ট্র হবে জনসাধারণের বন্ধু, সুহৃদ এবং সহমর্মী। কিন্তু রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটির জন্মই হয়েছে শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য। আরো খোলাসা করে বললে সমাজের উঁচুতলার মানুষ ওরফে ‘এলিট সোসাইটি’র স্বার্থ রক্ষার জন্য। তাইতো, মহাত্মা কার্ল মার্ক্স সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লোপ পাওয়ার<sup>০</sup> কথা বলেছেন। এ বড় দুঃসাহসিক কথা। মোদ্দা কথায় আসা যাক। রাষ্ট্রের স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, দায়িত্ব-কর্তব্য এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জানার জন্য জ্ঞানকাণ্ডে একখান মশরুড় ‘বিদ্যা’ আছে। জ্ঞানের ভাষায় এর নাম ‘রাষ্ট্র দর্শন’<sup>১</sup>। এ রাষ্ট্র দর্শনের উর্বর ময়দানে গিয়ে একবার পাক দিয়ে আসা যাক। এতে করে, রাষ্ট্রের কোন মহৎ কামে এ ‘সিভিল সোসাইটি’র প্রয়োজন বা রাষ্ট্রের কাঠামোয় এ ‘সিভিল সোসাইটি’র ভূমিকা কী, বা সমাজের এলিট সোসাইটির সাথে এ সিভিল সোসাইটির চরিত্রগত এবং কর্মগত কোন প্রকৃতির মিল বা অমিল বা গরমিল রয়েছে, তা একবার পরখ করা যাবে। পাশাপাশি বাংলা মূলকে যে মহান মহান শীলদের(!) নিয়ে

তথাকথিত ‘সুশীল সমাজ’ ও এর সক্রিয়তা দেখা যায়, তারা কি আদৌ ‘সুশীল সমাজ’ বা ‘সিভিল সোসাইটি’ নাকি শ্রেণী স্বার্থবাদী, বুর্জোয়া সমাজের চতুর অংশ ‘এলিট সোসাইটি’র মুখোশ সংস্করণ, সেটাকে একবার রাষ্ট্রদর্শনের কাঠগড়ায় দাঁড় করি সওয়াল জওয়াব করা।

॥ তেসরা ॥

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ বিজ্ঞানীরা এ তত্ত্ব দিয়েছেন। মানুষ রাজনৈতিক জীব। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এ তত্ত্ব দিয়েছেন। এরিস্টটল এ কথা চড়া গলায় বলেছেন। কিন্তু মানুষ একাধারে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব। কেননা, সমাজ যেমন রাজনীতির বাইরের কিছু নয়, তেমনি রাজনীতিও সমাজের অঙ্গ-ভুক্ত। সমাজ ও রাজনীতি চলে যুগলে, বগলে-বগলে। দুই সখী যেন দুই বোন। আসলে সমাজ ও রাজনীতি দুই ভুবনের এক বাসিন্দা। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো সভ্যতার গোড়ার দিককার সেই সরল বিশ্বাস নির্ভর ‘সমাজ’ই আজকের পরিবর্তিত এবং মহাপরাক্রমশীল রাষ্ট্র। মানুষের মধ্যে কেন এ রাষ্ট্রের প্রয়োজন দেখা দিল! মানুষ কিভাবে ‘রাষ্ট্র’ নামক একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেয়! আমরা ফরাসি দার্শনিক জঁ জ্যাক র’শোর জবানে শুনি। র’শো তাঁর জগদ্বিখ্যাত কেতাব ‘সোস্যাল কন্সট্রাক্টে’(১৭৬২)-এ বিষয়ে হলফ করে সবিস্মর আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, ‘মানুষের ইতিহাসে এমন একটি অবস্থা হাজির হলো, তখন ব্যক্তির পক্ষে প্রকৃতির রাজ্যে অবস্থান করবার বিরোধী শক্তিগুলি তার স্বপক্ষের শক্তির চাইতে অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠলো। প্রকৃতির রাজ্যে ব্যক্তির পক্ষে নিজের অবস্থান বজায় রাখার পক্ষে নিযুক্ত শক্তির চাইতে বিরোধী শক্তিগুলোর আধিক্য দেখা গেলো। এমন অবস্থায় প্রকৃতির রাজ্যে মূল ক্রিয়াশীল অবস্থাটি আর বিদ্যমান থাকতে পারছে না। এমন অবস্থায় মানবজাতির চরিত্র পরিবর্তিত না হলে, মনুষ্য জাতি হিসাবে প্রকৃতির রাজ্যে তার অস্বিকৃতি অনিবার্যভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো’<sup>১২</sup>। এভাবে মানুষ তার অস্বিকৃতির প্রয়োজনে একদিন সমাজবদ্ধ হয়। মানুষ সমাজবদ্ধ হয় অধিকতর, উন্নততর, নিশ্চিত ও স্বাধীন জীবন যাপন করার মতলবে। মানুষ জন্মগত ও প্রকৃতিগতভাবেই স্বাধিকার, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের এ স্বাধীনতা এবং প্রকৃতিগতভাবে সুশৃঙ্খল নিয়মের বিস্মরণ গুণগান পাওয়া যায় দার্শনিক হব্‌স-এর কেতাব ‘লেভিয়াথান’(১৬৫১)-এ। মহামতি হব্‌স এটাকে বলেছেন ‘ন্যাচারাল রাইটস’ ওরফে ‘প্রকৃতিপ্রদত্ত স্বাধীনতা’<sup>১৩</sup>। মানুষ তার এ প্রকৃতিপ্রদত্ত স্বাধিকার, স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব একটি সমষ্টিগত সংস্থার কাছে জমা দেয় নিজের অধিকার, স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বকে অধিকতর নিশ্চিত ও নিরাপদ করার অভিপ্রায়ে। মানুষের এ সমাজবদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়ায় যে ‘সংঘ’ গড়ে উঠে, তাই মূলতঃ রাষ্ট্র। রাষ্ট্রদর্শনে ‘সংঘ’ ভিত্তিক রাষ্ট্রগঠনের এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় ‘সামাজিক চুক্তি’<sup>১৪</sup>। মানুষ একটি চুক্তির মাধ্যমে এ ‘সমষ্টিগত সংঘ’ তৈরী করে। ফলে রাষ্ট্র এবং জনগণ ওরফে সিভিলদের মধ্যকার সম্পর্ক হবে ভ্রাতৃত্বের। পরস্পর হবে পরস্পরের সুহৃদ। গ্রামসি নিদার’ণ ভাষায় বয়ান করেছেন, ‘রাষ্ট্র হবে সিভিলদের রক্ষক ও প্রতিপালনকারী। সিভিলদের ভালো-মন্দের দেখ-ভালকারী ও অধিকার সংরক্ষণকারী’<sup>১৫</sup>। তাই, শ্রেণী বৈষম্যহীন আশরাফ-আতরাফহীন সকলের সমানাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় এ ‘সমাজ সংস্থা’। র’শো বয়ান করেন, ‘যেহেতু নিঃশর্ত ভাবে আমরা প্রত্যেকে সমর্পিত হয়েছি একটি সমষ্টিগত ইচ্ছা-সৃষ্ট ‘সমাজ সংস্থা’র কাছে, সে কারণে এখানে কারো সঙ্গে অপর কারো বিন্দুমাত্র বৈষম্য থাকা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকে এবং সকলে প্রত্যেকের এবং সকলের সমান। আর যেহেতু সকলের ক্ষেত্রে সমর্পণ হ’ছে সমান ও সামগ্রিক, সে কারণে সংস্থার সদস্যদের কার’র পক্ষেই অপর কার’র প্রতি কোনরূপ বৈষম্যের মাধ্যমে তার নিজের কোন যথার্থ স্বার্থ সাধিত হতে পারে না’<sup>১৬</sup>। এখন বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক। এ ব্যাখ্যার এক পর্যায়ে ‘সিভিল সোসাইটি’ কি চিহ্ন তার সাক্ষাৎ পাবো। মানুষ এভাবে চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। চুক্তি অনুযায়ী একদল রাজা হয়, একদল হয় প্রজা। রাজা এ মর্মে ‘সমাজ সংস্থা’ ওরফে রাষ্ট্রের দায়িত্ব নেয় যে, সে প্রজাদের স্বাধীনতা রক্ষা করবে, প্রজাদের জান-মালের হেফাজত করবে এবং প্রজাদের ভালো-মন্দের দেখ-ভাল করবে সর্বোপরি প্রজাহিতৈষী হবে। অন্যদিকে, প্রজারা রাজার একান্ত-বাধ্যগত থাকবে, রাজার কথা মেনে চলবে এবং রাজার অনুগত থাকবে। এবং চুক্তিতে এও থাকলো যে, রাজা যদি জনগণের আমানত (সংঘ বা রাষ্ট্রের) খেয়ানত করে, জনগণের প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করে, তবে জনগণ সে ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারে’<sup>১৭</sup>। র’শো এটাকে আরো একথাপ এগিয়ে রেখেছেন। তিনি বলেন ‘সর্বত্রই এ চুক্তি সর্বসম্মতিতে সম্পাদিত ও স্বীকৃত। ব্যাপারটার এ বোধ আমাদের সামগ্রিকভাবে এ রূপেই থাকতে হবে যে চুক্তির যদি কোন বিরোধীতা বা বিচ্যুতি ঘটে, তবে আবদ্ধ প্রত্যেক ব্যক্তি ইতোপূর্বে প্রদত্ত প্রত্যেকটি অধিকারই পুনরায় ফিরে পাবে। তার প্রাকৃতিক যে স্বাধীনতাকে সম্মতির ভিত্তিতে সে প্রদান করেছিলো, সে সম্পাদিত চুক্তির বিচ্যুতির কারণে তার নিজের প্রাকৃতিক স্বাধীনতা তার কাছে পুনরায় প্রত্যাশিত হবে’<sup>১৮</sup>। এখন মজার ব্যাপার হ’ছে রাজা তার দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিকমতো পালন করছে কিনা কিংবা রাজা চুক্তিভঙ্গ করছে কিনা প্রকারান্তরে প্রজারা চুক্তি মোতাবেক রাজার অনুগত কিনা কিংবা প্রজারা রাজার অবাধ্য হয়ে চুক্তি ভঙ্গ করছে কিনা তা দেখবে কে? এ সওয়াল সামনে আসলো। ডেভিড হিউম তার অরিজিনার কন্সট্রাক্ট(১৭৪৮)-এ বয়ান করেন, ‘সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা চুক্তির মাধ্যমে অন্যের কাছে প্রদত্ত হলেও তা ভঙ্গ হ’ছে কিনা তার নজরদারি করা দরকার’<sup>১৯</sup>। চুক্তির মাধ্যমে প্রজার ব্যাধি সারাবে রাজা কিন্তু রাজার ব্যাধি সারাবে কে? ওঁবা দরকার হলো। তখনই প্রজাদের (সিভিল) মধ্য থেকে আরেকদল প্রতিনিধি নির্বাচন করা হলো। এদের কাজ হ’ছে রাজা চুক্তি ভঙ্গ করছে কিনা তদারকি করা। আর এরাই হ’ছে ‘সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি’। জন্মের গুণে এরা ‘সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি’ হলেও কালের গুণে এরাই হয়ে উঠে ‘সিভিল সোসাইটি’। জন লক এদের বলেছেন ‘পলিটিক্যাল সোসাইটি’। থমাস হব্‌স বলেছেন ‘সিভিল সোসাইটি’। মেকিয়াভ্যালি তার বিখ্যাত গ্রন্থ ‘দ্যা প্রিন্স’(১৫৩২)-এ বলেছেন ‘সিভিল প্রিন্সিপালিটি’<sup>২০</sup>। মানব সমাজের শুরুতেই সংঘবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ বা রাষ্ট্রবদ্ধ জীবনের প্রারম্ভনায় এ ‘সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি’ ধারণাটিই সময়ের প্রক্রিয়াময় পৃথিবী ঘুরে আজকে বাংলাদেশে এসে নামায়ন হয়েছে ‘সুশীল সমাজ’। ইতোমধ্যে পৃথিবী পাড়ি দিয়েছে হাজার বছর। ব্রহ্মপুত্র দিয়ে গড়িয়ে গেছে কতো জল। নীল নদের পানি আর নীল নাই। সভ্যতার উন্মাদনায় লাল হয়ে

গেছে। মানুষের সভ্যতা, সমাজ, সময় ও চিন্তা-পাল্টে গেছে। বিবর্তন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন এবং বিকাশের মাধ্যমে মানব সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি তার নিজের একটি আদল ধারণ করেছে। মানুষ নিজেদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ও প্রতিপত্তি লাভের লগে লগে নিজে হয়ে উঠেছে জটিল, কুটিল, চতুর, স্বার্থপর, ভোগবাদি ও আত্মপর। ফলে, ‘সিভিল সোসাইটি’র প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব সমাজ ও সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে অতোটা অনুতত না হলেও হাল আমলে এর ভূমিকা ও গুরুত্ব কেবল বেড়েই চলেছে। বর্তমান সময়ে এর প্রয়োজনীয়তা হয়ে উঠেছে অনস্বীকার্য। প্রজারা যদি ‘সিভিল’ হয় তবে তাদের এবং দেশের ভালোমন্দ দেখার প্রতিনিধি তো ‘সিভিল সোসাইটি’ই হবেন। আর রাজা যেহেতু প্রজার আনুকূল্য নিয়ে রাষ্ট্রের ক্ষমতা অর্জন করেন<sup>১</sup> সেহেতু রাজা প্রজার (সিভিল) প্রতি স্থায়ী দায়িত্ব পালন করছেন কিনা তা তদারকি করার জন্য একটি সত্যিকার ‘সিভিল সোসাইটি’র প্রয়োজন। উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তি গত দিক দিয়ে, ভাবে এবং স্বভাবের দিক দিয়ে ঠিকই তো আছে। কিন্তু ঘাপলা হে<sup>২</sup> অন্য জায়গায়। চরিত্রগত ভাবে এ ‘সিভিল সোসাইটি’ সাধারণ জনগণের প্রতিনিধি হওয়ার কথা থাকলেও বর্তমান দুনিয়ার প্রেক্ষাপটে এ ‘সিভিল সোসাইটি’ মূলতঃ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে, যে রাষ্ট্রের ভূমিকা হে<sup>৩</sup> সমাজের এলিট শ্রেণীর ও বুজোয়া শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ করা। আরো খোলাসা করে বললে, এ ‘সিভিল সোসাইটি’ প্রকৃতার্থে এবং প্রায়োগিক অর্থে ‘সামাজের এলিট শ্রেণী’ই বটে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি আরো গুরুতর। কেই গোস্সা করলে মার্জনা করবেন।

## ৥ চোঠা ৥

বাংলাদেশে ‘সিভিল সোসাইটি’র ধারণাটিকে বিভিন্ন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার ফতোয়া পরানো হয়। কেউ এটাকে বলেন ‘নাগরিক সমাজ’, কেই বা বলেন ‘গণতান্ত্রিক সমাজ’, কেউ বলেন ‘সুশীল সমাজ’ আবার কেউ বা বলেন ‘সভ্য সমাজ’<sup>৪</sup>। যেভাবেই এর চরিত্র জাহির করা হোক না কেন, সব রসুনের তলা এক। চোরে চোরে মাসতুতু ভাই। বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে এ ‘সিভিল সোসাইটি’র একটু নাড়ির খবর নেয়া যাক। বাংলাদেশে ‘সিভিল সোসাইটি’ ধারণাটির ব্যবহার এবং চর্চা খুব বেশি দিনের নয়। স্বাধীনতা-পূর্ব এবং স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ‘সিভিল সোসাইটি’র ধারণা এবং প্রয়োগের মধ্যে বিস্মর ফারাক দেখা যায়। স্বাধীনতা-পূর্ব ‘সিভিল সোসাইটি’ বলতে সচেতন ছাত্র সমাজ, পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী সর্বসাধারণের সমষ্টিগত এবং সমন্বয়গত ঐক্যতাকে বোঝানো হতো<sup>৫</sup>। কেননা, তখন শাসক ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানি আর ‘সিভিল’ ছিলো পূর্ব পাকিস্তানি (বর্তমান বাংলাদেশ)। ফলে, ‘সিভিল সোসাইটি’র প্রতিনিধি বলতে সহি অর্থে যে মহাঘটি নির্দেশ করে, পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ জনগণের প্রতিনিধিরা ছিলেন সত্যিকার অর্থেই ‘সিভিল সোসাইটি’র প্রতিনিধি’ ওরফে ‘সিভিল সোসাইটি’। কিন্তু ঘাপলাটা গুরু হলো স্বাধীনতার পরে। যি তো আর সবার পেটে হজম হয়না। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে এ ‘সিভিল সোসাইটি’র রূপ, রস এবং গন্ধের মধ্যে আমূল পরিবর্তন চলে আসে। ‘সিভিল সোসাইটি’র প্রতিনিধিরা আসতে থাকে সমাজের ‘এলিট সোসাইটি’ থেকে। ফলে, ‘সিভিল সোসাইটি’ ব্যবহারিক এবং প্রায়োগিক অর্থে সিভিলদের স্বার্থ না দেখে এলিটদের তথা শাসক শ্রেণীর স্বার্থ দেখতে গুরু করে। তাই, যে অর্থেই একে ব্যবহার করা হোক না কেন, শ্রেণী স্বার্থের ঘেরা টোপে, ‘সিভিল সোসাইটি’ তার জন্মগত চরিত্র পাল্টে ফেলেছে। এ ‘সিভিল সোসাইটি’ আর সিভিলদের ওরফে সাধারণ জনগণের চোহদ্দিতে নাই। সমাজকে এক শ্রেণীর লোক ‘সিভিল সোসাইটি’র মহৎ আত্মটাকে হাইজ্যাক করে নিজেদের বগলে নিয়েছে। সমাজের ‘এলিট শ্রেণীর’ লোকেরাই এদেশের ‘সিভিল সোসাইটি’র সাইনবোর্ড ধারণ করেছে। এরা তাপানুকূল র<sup>৬</sup>মে বসে মিনারেল ওয়াটারে গলা ভিজিয়ে সমাজের সমস্যা নিয়ে বিদেশী দাতার (!) টাকায় স্বদেশী মদদদাতা হিসাবে লেকচার দেন, সেমিনার সিস্টেমাজিয়াম করে ‘সিভিল সোসাইটি’র ঢোল পিটান। আর সিভিলদের মরমর অবস্থায় নাকে তেল দিয়ে ঘুমায়। এ বড় তাজ্জব ব্যাপার। দেশের সত্যিকার সিভিলদের ন্যূনতম মানবাধিকার হরণ করে নি<sup>৭</sup>ছ রাষ্ট্র নামক দানবটি, বেঁচে থাকার প্রাণাশ-লড়াইয়ে সত্যিকার সিভিলদের যখন জান উঠাগত তখনও এ ‘সিভিল সোসাইটি’ আছে মাল কামানোর তালে। দেশপ্রেমের জোয়ারে ভাসতে থাকা এ সিভিল সোসাইটির তলে তলে এক নির্মম ও বিকৃত ভাটার অস্তিত্ব। বাংলাদেশের ‘সিভিল সোসাইটি’র চরিত্র এবং কর্মগত একটি প্রোপাইল করেছেন হাসনাত আব্দুল হাই। ‘সিভিল সোসাইটি’র মধ্যে তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছেন ‘মিডিয়া(প্রেস, বেতার ও টিভি), ট্রেড ইউনিয়ন, পেশাজীবী, বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং সমাজকল্যাণ মূলক সংগঠন সমূহ’<sup>৮</sup>। এ হে<sup>৯</sup>ছ আমাদের গুণধর ‘সিভিল সোসাইটি’। তিনি আরো যা উল্লেখ করেননি, তাহলো বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটির ফেঁস্টুন ধরে আরো বগল বাজায় অবসর প্রাপ্ত আমলা, এনজিও প্রতিনিধি, অব: সামরিক কর্মকর্তা, বিভিন্ন কম্পালটেন্সি প্রতিষ্ঠান, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর প্রতিনিধি, বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠন এবং ধনাত্মক ব্যবসায়ী। বুঝুন ঠ্যাল। আজিবি কারখানা। এসব বগল বাজানো নাম সর্বস্ব তথাকথিত ‘সিভিল সোসাইটি’র সঙ্গে সত্যিকার সিভিলদের হাঁচা কোন সম্পর্ক নেই। এরা জানেনা পঞ্চগড়ের কৃষক কলিমুদ্দিনের ক্ষুধার যন্ত্রণা কী, এরা উপলব্ধি করেনা মারিয়ার বাবার আহাজারি, এরা শুনেনা মাহিমার আত্মচিংকার, এরা অনুভব করেনা সিতারাম দেবীর আত্ননাদ, এরা জানেনা কৃষক-শ্রমিক-দিনমজুরের শ্রম শোষণের নিষ্ঠুরতা। অথচ এরাই হে<sup>১০</sup>ছ ‘সিভিল সোসাইটি’র প্রতিনিধি’ ওরফে ‘সিভিল সোসাইটি’। আর আজকে যারা শিক্ষিত শহুরে নাগরিক শ্রেণীর চতুর অংশ ওরফে ‘সিভিল সোসাইটি’ এরা হে<sup>১১</sup>ছ সমাজের ‘এলিট সোসাইটি’ বা ‘অভিজাত শ্রেণী’। এরা হে<sup>১২</sup>ছ, প্রকৃতপক্ষে শাসক শ্রেণীর দোসর। বাংলাদেশের কোন কোন গবেষক-বুদ্ধিজীবী ‘সিভিল সোসাইটি’র সাথে সুশাসনের<sup>১৩</sup> সম্পর্ক দেখানোর চেষ্টা করেছেন। বলা হে<sup>১৪</sup>ছ ‘একটি কার্যকর ‘সিভিল সোসাইটি’ রাষ্ট্রে সুশাসন নিশ্চিত করতে পারে। কিন্তু, বাংলাদেশের বিদ্যমান এবং সক্রিয় ‘সিভিল সোসাইটি’ রাষ্ট্রযন্ত্রেই একটি অংশ। যে রাষ্ট্র এলিটদের স্বার্থকে রক্ষা করে সে রাষ্ট্র সিভিলদের কল্যাণ চিন্তা করতে পারেনা। আর যেহেতু ‘সিভিল সোসাইটি’ হে<sup>১৫</sup>ছ সমাজের ‘এলিট সোসাইটি’র তাই রাষ্ট্রের স্বার্থ দেখাই তাদের কাম। এটাই আসল কাম, উপরের মুখোশটা আকাম। সিভিলদের বেঁচে সিভিলদের সাথে গান্দারী করে রাষ্ট্রের পোন্দারী করাই বর্তমান ‘সিভিল সোসাইটি’র ভূমিকা। এরা

সাম্রাজ্যবাদের খায় এবং সুশীল সমাজের মোষ তাড়ায়। আমরা ছা-পোষা সিভিলেরা ‘ভাব’ নিয়ে ‘স্বভাবে’ পরনির্ভরশীল হয়ে ‘অভাবে’ দিন কাটায়। জন লক এতো হক কথা বললেন, কিন্তু কিভাবে এ সিভিলদের ‘ভাব’ ছুটানো যায় তা বললেন না। কেননা, সিভিলদের ভাব ছুটালেই ‘সিভিল সোসাইটি’র স্বভাব পরিবর্তন হবে বা পরিবর্তন করতে বাধ্য করানো হবে। মার্শ্ব অবশ্য বলেছেন। কিন্তু সেটা তো রাজনীতির ব্যাপার। কিন্তু ছা-পোষা সিভিলেরা কি আর রাজনীতি বোঝে! হব্‌সও বললেন না ‘সিভিল সোসাইটি’ রাষ্ট্রের ব্যারাম তড়ায়ে কিন্তু ‘সিভিল সোসাইটি’র ব্যামো সারাবে কে? ব্যারাম সারানোর জন্য ঔষধ দরকার কিন্তু ঔষধ সারাবে কে? এ বড় মুসিবতের সাওয়াল। আজকে এ সওয়ালের জবাব খোঁজা বড্ড বেশি প্রয়োজন।

॥ বাড়তি বয়ান! ॥

সমসাময়িক বাংলাদেশ অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় জীবনে একটি ত্রাণসিঞ্চাল অতিক্রম করছে। সমাজের রক্ত্রে রক্ত্রে অস্থিরতা, দুর্নীতি, অসততা এবং অসহিষ্ণুতা প্রবল প্রতাশে বিরাজ করছে। মানুষের সামগ্রিক দায়িত্বজ্ঞান, কর্তব্যনিষ্ঠতা, সত্যপরায়নতা আজ সমাজদেহ থেকে প্রায় বিতাড়িত। এরকম একটি সময়ে রাষ্ট্রের যেখানে মানুষের বন্ধু হওয়ার কথা সেখানে রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে সাধারণ জনগণের শত্রু। দ্রাতৃহ্রেও সম্পন্ন হয়ে উঠেছে প্রতিপক্ষের। সাধারণ সিভিলরা একটু শান্নির প্রত্যাশায়, একটু ভালো থাকার আশায় এ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেয় একটি রাজনৈতিক দলকে। কিন্তু রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেলেই সকলে জনগণের সেবক না হয়ে শাসক না হয়ে শোষক হয়ে উঠে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। এ রকম একটা হতাশাবাঞ্জক পরিস্থিতিতে একটি শক্তিশালি ‘সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি’ বা ‘সিভিল সোসাইটি’র প্রয়োজনীয়তা একান্তই আবশ্যিক। এ ‘সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি’ই সরকারকে রাষ্ট্রের রক্ষক হিসাবে পরিচালিত করবে বা করতে বাধ্য করবে। সাধারণ জনগণের (সিভিলদের) স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট থাকবে। জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধি হয়ে সরকারকে জনগণের কল্যাণ চিন্তা করতে প্ররোচিত ও প্ররোচিত করবে। সরকার এবং জনগণের মধ্যে বা রাষ্ট্র এবং জনগণের মধ্যে একটি দ্রাতৃহ্রের সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করবে এ ‘সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি’ বা ‘সিভিল সোসাইটি’। এ ‘সিভিল সোসাইটি’ একাধারে সরকারের স্বেচ্ছাচারি হওয়াকে যেমন প্রতিরোধ করবে তেমনি জনগণকেও দেশের আইন-শৃংখলা সুরক্ষা ও দেশের উন্নয়ন-সমৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেবে। এ ‘সিভিল সোসাইটি’ই তাঁদের ইতিবাচক ভূমিকার মধ্যদিয়ে রাষ্ট্রকে সত্যিকার অর্থে জনগণের বন্ধু হিসাবে পরিণত করতে পারবে। সরকারকেও জনগণের শাসক না হয়ে সেবকে পরিণত করতে পারবে। আর সত্যিকার অর্থেই যদি ‘সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি’র কার্যক্রম ইতিবাচক এবং গুণাত্মক ভূমিকা রাখতে পারে তবেই এর জন্মগত, ঐতিহ্যগত এবং ঐতিহাসিক মাহাত্ম্য সাফল্যমণ্ডিত হবে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, সকল তত্ত্বই মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি হয়। মানুষ তা চর্চার মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে বিধায় তত্ত্বের অপকার সাধারণ মানুষের জীবনে অনুভূত ও উপলব্ধ হয়। ‘সিভিল সোসাইটি’র ক্ষেত্রেও বাংলাদেশে তত্ত্ব ও চর্চার মধ্যে বিস্মর পার্থক্য। এ পার্থক্য দূরীকরণের মধ্যেই একটি সুন্দর, স্বাধী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব।

॥ इदिस ॥

<sup>1</sup> wf ct' `wbk l BqtlvZ, *000K e`ev` cwiPvZ*, (Abev` : kixd nvi"Y), evsj v GKvtWqx, 1996: cõv-8

<sup>2</sup> Wf c† - wK l B†q†LvZ, c†er<sup>3</sup>, c†v-9

<sup>3</sup> Karl Marx, *Capital*, Volume-1, Progress Publication, Mosco, 1986, page-713

<sup>4</sup>  $\mathbb{W}^f \subset \mathbb{C}^f \subset \mathbb{W}^K \subset \mathbb{B}^f \subset \mathbb{L}^f \subset \mathbb{Z}^f$ ,  $c \notin \text{ev}^G$ ,  $c \notin \text{iv}^7$ 

<sup>5</sup> Kij Gy. 9 | t d m K G t h j i n - G i K u g D i b o t g u b t d o z G e s w e t k l K t i g y t . P *Ōmim K'im Ulyj ō c k u k z* n l q v i c i g u b l , g u b l i m g v R , m s - u z l m f z v i D m e l w e K u k G e s M u z c k u z m o u t K g u b l i m b v z b i p s q G k u l b z b G e s G t K e r t i w f b a g v i h y p n q | h v m g v R , i v R b u z i , A - b u z i A s h M z D c r v b . i j i w e K u k l M u z c k u z m o u t K G k u l - \* Q a r i Y v t q | G e s G Z Ė w e k e v i c i p s h R M i z G k u l A v i j v o b m y o K t i |

<sup>6</sup> John Locke , *Two Treatises of Government*, Cambridge University Press , England, 1965, page-361

<sup>7</sup> miv gj w Lvb, i v o m g u t R i D r c i E: R b j t K i m t 1/2 w e P r i , w e k t m i n Z t K t <sup>a</sup>, Xv K v, 2001, c o v - 2

<sup>8</sup> ewYK mgyR ej v hvq G At<sub>1</sub> qh, G umwifj tmmvBwU KBbBb wewu Kti AtbK tek e'eww RugtqtQ | tewYqv Zwi Kvq AtbK G umwifj tmmvBwU bvgK gnvNwU tePv wewu Kti fiv B qvj cwb KvqvB Kti tQ |

<sup>9</sup> Karl Marx, *Capital*, page-339

<sup>10</sup> Añb | mŁvRx, © mŕg'evt' i K ¼, RvZxq mwñZ" cKvkb, XvKv, 1987, cõv-15

<sup>11</sup> Anthony Quinton (edited), *Political Philosophy*, Oxford University Press, Hongkong, 1990, Page-32

<sup>12</sup> Rousseau, *Social Contract* in Sir Ernest Barker, ed. 'Social Contract, essay by Locke, Hume and Rousseau ' Oxford University press, London, 1966, page-254

<sup>13</sup> Thomas Hobbes, *Leviathan*, Everyman's Library, New York, 1965, page-63

<sup>14</sup> Sir Ernest Barker, ed. 'Social Contract, essay by Locke, Hume and Rousseau' Oxford University press, London, 1966, page-Introduction.

- 
- <sup>15</sup> Antonio Gramsci, *State and Civil Society*, in Selections from the Prison Notebooks, Edited and Translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith, Orient Longman, India, 1998, page-210.
- <sup>16</sup> Rousseau, *পূর্বোক্ত*, page-255
- <sup>17</sup> Thomas Hobbs, *পূর্বোক্ত*, page-91
- <sup>18</sup> Rousseau, *পূর্বোক্ত*, page-255
- <sup>19</sup> David Hume, *Original Contract*, Sir Ernest Barker, ed. 'Social Contract, essay by Locke, Hume and Rousseau ' Oxford University press, London, 1966, page-221
- <sup>20</sup> Nicolo Machiavelli, *The Prince*, Worlds worth References Ltd, London, 1993, Page-73
- <sup>21</sup> Nicolo Machiavelli, *পূর্বোক্ত*, পৃষ্ঠা-৭৩
- <sup>22</sup> মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ কুমার রায় , বাংলাদেশের সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, অবসর প্রকাশনী সংস্থা, বাংলাদেশ, ১৯৯৫, ভূমিকা।
- <sup>23</sup> মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ কুমার রায় , *পূর্বোক্ত*, পৃষ্ঠা-১১
- <sup>24</sup> Hasnat Abdul Hye (etd) *Governance: south Asian Perspective*, University Press Limited, Bangladesh, 2000, page-27
- <sup>25</sup> Kamal Siddiqui, *Towards Good Governance*, Fifty unpleasant Essays, University Press Limited, Bangladesh, 1996, Page-5

রাহমান নাসির উদ্দিন: পি.এইচ.ডি. গবেষক, কিল্লোটে বিশ্ববিদ্যালয় ও সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।  
ইমেইল: rahmannasircu@yahoo.com